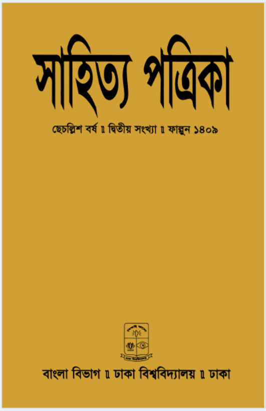

সাহিত্য পত্রিকা

ছেচল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৯

বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ঢাকা

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (১ম খণ্ড)

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ সাইফুল ইসলাম
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.341
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.341
Pages	161-170
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ-আলোচনা

Check for updates

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান-এর

বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (১ম খণ্ড)

'ধারণী সাহিত্য-সংসদ', ২৫৪, রথখোলা, ঢাকা।
প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারী-২০০৪, মূল্য ২৫০.০০ টাকা মাত্র।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. এস.এম. লুৎফর রহমানের "বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস" প্রকাশিত হ'য়েছে। এ-গ্রন্থ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চেতনার-আলোকে আলোকিত একখানি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতে সংযোজিত তিনটি প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ সালের বাঙালা বিভাগীয় "সাহিত্য পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে প্রবন্ধগুলোর ব্যতিক্রমী তথ্য ও বক্তব্য পাঠকদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে। রচনাত্রয় হ'ল—"বাঙালা লিপির উৎস-নির্ণয়ে তন্ত্র-সাহিত্য", "উনিশ শতকের ফারছী-বাঙালায় লেখা মুছলিম গদ্যের নমুনা" এবং "বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম"। নাম থেকেই স্পষ্ট—রচনাগুলো সাধারণ নয়; অসাধারণ চিন্তা-ভাবনা ও তথ্য-আহরণের ফসল।

বর্তমান পুস্তকে, এই তিনটি নিবন্ধের সাথে যোগ করা হ'য়েছে আরও চারটি রচনা; যথাক্রমে "বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার নাম ফারছী বাঙালা", "মুছলমানরাই বাঙালা ভাষার আদি ওয়ালেদ", "মুছলমানরাই বাঙালা গদ্যের আদি জনক" এবং "পাঁচ শ' বছরের বাঙালা সাহিত্যে বাঙালীর জাতি-পরিচয়"। নিবন্ধগুলোর প্রত্যেকটির নাম থেকেই ব্যতিক্রমী ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় লেখক এসব রচনার তত্ত্ব, তথ্য ও সিদ্ধান্ত কোথা থেকে কি ভাবে আহরণ ক'রেছেন—তা গ্রন্থ-ভূমিকা "দিবাচা"য় জানিয়ে দিয়েছেন। এই মুখবন্ধটি পুরোপুরি প'ড়লে, সমগ্র গ্রন্থের অসাধারণত্বের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমনকি, বই হাতে নিলেই যে-কোন পাঠক প্রথম যে-বিস্ময়ের মুখোমুখী হ'বেন—তা হ'ল—লেখক কিছু কিছু শব্দের প্রচলিত বানান লেখেননি; যেমন—ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, ফার্সী, হোসেন ইত্যাদি। তিনি এসব শব্দের বানান লিখেছেন—'ইছলাম', 'মুছলিম', 'মুছলমান,' 'ফারছী', 'হোছেন' প্রভৃতি। এরকম কেন লিখেছেন—তা জানার কৌতূহল আগেই যদি কেউ মেটাতে চান,

তবে ড. রহ্মান—তাঁকে প্রথম "বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেটি সুপরামর্শই। তিনি "বাংলা" শব্দের ঠিক ও বেঠিক বানানের দিকেও দেশী-বিদেশী-সূত্রে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন।

এ-গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকার অংশ-বিশেষ; গত বছর একটি জাতীয় দৈনিকের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লে, জনৈক ফয়েজ আলম তার যে-আলোচনা করেন; গ্রন্থকার সে-রচনাটি পরিশিষ্টে মুদ্রণ ক'রেছেন। ফলে, গ্রন্থ-পাঠক; লেখকের বক্তব্যের উৎস-সম্পর্কীয় মূল্যায়ন জানতে পারবেন; যা লাভের ওপর অতিরিক্ত প্রাপ্তি ব'লে গণ্য হবে।

বস্তুতঃ এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি নিবন্ধ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনার অবকাশ থাকলেও আমি এখানে শুধু "বাঙালা ভাষায় আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম" শীর্ষক নিবন্ধের দু'একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ক'রব।

আমার বিবেচনায়—ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান-রচিত "বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম"-শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি দৃষ্টি-আকর্ষণকারী গবেষণামূলক নিবন্ধ। সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এ-নিবন্ধের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ ক'রে চিন্তাশীল পাঠকগণ বাঙালা ভাষার এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দের বানান সম্পর্কে ব্যতিক্রমী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে বাধ্য। কারণ গবেষক কোন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না ক'রে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন, যা জানা; বর্তমানে আমাদের লেখালেখির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তিনি যে-সব শব্দের বানানের সংস্কৃতায়নের কথা উল্লেখ ক'রেছেন—সেগুলোর বর্তমান ভিত্তিই যে দুর্বল ও অগ্রহণীয়—তা দেখিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রতি-বর্ণায়নের প্রতি সার্বিক কটাক্ষ ক'রে লিখেছেন—"যে-কোন অর্থেই প্রতিবর্ণায়ন একটি ভুল ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ।" তিনি আরো লিখেছেন—"তাই প্রয়োজন—প্রতিবর্ণায়ন নয়; প্রতিরূপ-আওয়াজ উৎপাদন। অনুরূপ ধ্বনি-উৎপাদন।"

ড. রহ্মানের এসব বক্তব্যের স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজী ভাষার দিকে একটু লক্ষ্য ক'রলেই দেখতে পাওয় যায়, ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম

হরফটির 'A'-এর উচ্চারণ কখনো 'অ', 'আ', বা 'অ্যা'। উদাহরণ—Rahim (রহিম), Karim,(করিম)—এখানে 'A'-এর উচ্চারণ—'অ'। আবার Arjumand (আরজুমান্দ), Asma (আছমা), Abdul (আবদুল),—এখানে 'A' এর উচ্চারণ 'আ' ধ্বনি। এবং Ago (অ্যাগো)—পূর্বে; Agonostic (অ্যাগোনস্টিক)—আজ্ঞেয়বাদী,—এখানে 'A'-এর উচ্চারণ 'অ্যা'।

প্রতিবর্ণায়ন করার ফলে যে-ভুল উচ্চারণ ঘটে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ August (অগাস্ট) শব্দটি। এখানে A-এর উচ্চারণ—'অ' লক্ষণীয়, বেশির ভাগ লেখক-ই প্রতিবর্ণায়ন করেন ব'লে অগাস্টকে "আগষ্ট" উচ্চারণে লিখে থাকেন। তাঁরা শুদ্ধ ক'রে অগাস্ট উচ্চারণ ক'রতে পারেন না বা ক'রেন না।

এবার ইংরেজী 'U'-বর্ণের উচ্চারণের দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায়—But (বাট), Cut (কাট), Put (পুট)। এখানে 'U'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে 'আ', 'আ', 'উ'। এছাড়া ইংরেজীতে প্রথম পাঁচটি বর্ণ এক-ই হওয়া সত্ত্বেও শেষ তিনটি হরফের কারণে উচ্চারণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়; এরকম দু'টি শব্দ যথাক্রমে—Chaldean (ক্যালডীয়ান)—ক্যালডীয় বা ব্যাবিলন সংক্রান্ত ও Chaldron (চলড্রন)—কয়লার পরিমাণ বিশেষ।

বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী শব্দের প্রতিবর্ণায়নের মানদণ্ড রূপে গৃহীত ইংরেজী বর্ণমালার-ই যখন এরকম অবস্থা, তখন যে-কোনো অর্থে "প্রতিবর্ণায়ন" যে "একটি ভুল ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ" তা বলা চলে।

প্রতিবর্ণায়নের ফলে বাঙালায় অসংখ্য প্রচলিত ভুলের জন্ম হ'য়েছে। যেমন: জন্মাষ্টমী, অষ্টম ইত্যাদি। এই দু'টি শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এ-দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোক—মাষ্টার, রেজিষ্ট্রেশন, ষ্টার, ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি লিখে থাকেন। ইংরেজী শব্দের এরকম ভুল বানান লেখার প্রবণতা এখনও অপ্রতিহত গতিতে চ'লছে। অথচ ব্যাকরণ সম্বন্ধে যিনি কিঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন, তিনি নিজেও জানেন ইংরেজীতে মূর্ধন্য-'ষ' মূর্ধন্য-'ণ'–এর কোনো উচ্চারণ বা ব্যবহার নেই। প্রকৃত পক্ষে উপর্যুক্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ রূপ হবে মাস্টার, রেজিস্ট্রেশন, স্টার, স্টেডিয়াম ইত্যাদি। বাঙালাতে সাধারণতঃ র, ষ, ক্ষ-এর পরে মূধর্ণ্য-'ণ' ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 'ট' বর্গীয় বর্ণের পূর্বে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজীতে 'ণ'-এর ব্যবহার নেই, তা সত্ত্বেও প্রতিবর্ণায়নের প্রবণতার ফলে, এরকম অসংখ্য প্রচলিত ভুল বানানের জন্ম হ'য়েছে। উদাহরণ হিসেবে, বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত টাকার নোটের কথা বলা যায়। এ টাকার

ওপরে—"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বে প্রবর্তিত
লুৎফর রহমান সরকার"

এই কথার নিচেয় লেখা "গভর্ণর" যা ভুল বানানে লেখা হ'য়েছে; এর শুদ্ধরূপ হবে—'গভর্নর'।

আবার লণ্ডন, ষ্ট্যাণ্ড, কর্ণার, হর্ণ ইত্যাদি বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হয় ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকার কারণে। এসব স্থানে হওয়া উচিত লন্ডন, স্ট্যান্ড, কর্নার, হর্ন ইত্যাদি।

প্রতিবর্ণায়নের ফলে ভাষা হ'য়ে উঠেছে অসংস্কৃত, অসংযত ও অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই খ্রীষ্টীয় সনকে খ্রীষ্টীয় না লিখে লেখা হ'চ্ছে 'ইংরেজী'। প্রতিবর্ণায়নের কুপ্রভাবে এদেশের লোকেরা মনে করে বাঙালা সনের মতই ইংরেজী সন। আসলে ইংরেজী সন ব'লে কিছু নেই। ইংরেজ শাসকরা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তারা খ্রীষ্টীয় সনকে অনুসরণ ক'রতো, যা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাথে সম্পর্কিত। সেটাকেই ভুলক্রমে ইংরেজী সাল ব'লে এযাবৎ লিখে আসা হ'চ্ছে। প্রতিবর্ণায়ণের কুপ্রভাবে এমনটি ঘ'টছে।

ড. রহ্মান তাঁর প্রবন্ধে আরবী, ফারছী ও উরদু শব্দের বাঙালা বানানে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সমালোচনায় 'ছ' স্থানে 'স'-এর ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে ব'লেছেন—"বাঙালা লিপির ইতিহাস-এর দিক থেকে বিচার ক'রলেও ড. (সুনীতিকুমার) চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কারণ বাঙালীর বাঙালা ভাষার পাঁচ-সাতশ' বছরী অবিচ্ছিন্ন , অবিভক্ত মূলধারায় 'শ'–ধ্বনিটি ছিল অনাত্মীয় বা foreign. তাঁদের লিখিত পুথি-পুস্তকে তো বটেই, বাঙালা লিপির অনুক্রমেও তালব্য 'শ' নয়, দন্ত্য 'স'-এর ছিল অগ্রাধিকার।"

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এ-বক্তব্য যে প্রামাণিক, তা বাঙালা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পরিচিত 'চর্যাপদে'র লিপি-বিশ্লেষণ ক'রলে জানা যায়। অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যায়, চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দে 'স' হরফ-এর সংখ্যা 'শ'-এর চেয়ে প্রায় ১২ গুণ বেশী।

প্রমাণ স্বরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়—

সারণী-১

চর্যার-সংখ্যা	'স'-হরফের ব্যবহার	'শ'-হরফের ব্যবহার
চর্যা-১	৭	X
চর্যা-২	৬	X
চর্যা-৩	৬	৩
চর্যা-৪	৪	৪
চর্যা-৫	৩	X
চর্যা-৬	১১	১
চর্যা-৭	৭	X
চর্যা-৮	৪	X
চর্যা-৯	৮	X
চর্যা-১০	১০	X
চর্যা-১১	৩	৩
চর্যা-১২	৪	১
চর্যা-১৩	৯	২
চর্যা-১৪	৮	X
চর্যা-১৫	১৫	X
চর্যা-১৬	৯	X
চর্যা-১৭	১৪	X
চর্যা-১৮	৬	X
চর্যা-১৯	৭	X
চর্যা-২০	৬	X
চর্যা-২১	৯	১
চর্যা-২২	১২	১
চর্যা-২৩	১৪	X
চর্যা-২৪ মূল পাঠ পাওয়া যায়নি।		
চর্যা-২৫	১	X
চর্যা-২৬	১৪	X
চর্যা-২৭	১৩	X
চর্যা-২৮	২০	১
চর্যা-২৯	৯	X
চর্যা-৩০	৮	X
চর্যা-৩১	৫	X
চর্যা-৩২	৬	X
চর্যা-৩৩	৭	১
চর্যা-৩৪	৯	১
চর্যা-৩৫	৫	১
চর্যা-৩৬	১০	১
চর্যা ৩৭	১১	১
চর্যা-৩৮	৫	X
চর্যা-৩৯	১৩	X
চর্যা-৪০	১৩	X
চর্যা-৪১	১৮	X
চর্যা-৪২	১০	১
চর্যা-৪৩	১১	X
চর্যা-৪৪	৯	X
চর্যা-৪৫	৯	X
চর্যা-৪৬	৫	১
চর্যা-৪৭	৬	৪
চর্যা-৪৮ মূল পাঠ পাওয়া যায়নি।		
চর্যা-৪৯	৬	১
চর্যা-৫০	১৪	৭
সর্বমোট	=৪১৪	৩৪
	৯১,৭৯% =	৮.২১% মাত্র।

উপরের তালিকা অনুযায়ী শতকরা প্রায় ৯২% ক্ষেত্রে 'স' এবং মাত্র ৮% ক্ষেত্রে 'শ' ব্যবহৃত হ'য়েছে। তাহলে 'স' হরফটি যে, বাঙালীর আত্মীয় সম্পর্কের হরফ এবং 'শ' হরফটি অনাত্মীয়—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আরও লক্ষণীয়, চর্যাপদের ৫০টি চর্যার মধ্যে অর্ধেকের-ই বেশী অর্থাৎ ২৬টি চর্যায় তালব্য 'শ'-

হরফ একেবারেই নেই ।[১]

এ-প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য হ'ল—হ্যালহেড-রচিত বাঙালা ব্যাকরণের মুদ্রিত উদ্ধৃতির আলোকচিত্র থেকেও দেখা যায় একটি পৃষ্ঠায় দুইটি শব্দে 'শ' হরফের ব্যবহার র'য়েছে। আর সতেরটি শব্দে 'স' হরফের ব্যবহার বিদ্যমান।

আলোক-চিত্রটি লক্ষ্য ক'রলে আরও দেখা যায়, আধুনিককালে যে-সব শব্দে 'শ' ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে, তখন সে-সব শব্দে 'স' ব্যবহার করা হ'ত। উদাহরণঃ সুনি, সুনিয়া, সুন ইত্যাদি।

আবার এখন যে-সব শব্দে 'য' ব্যবহার করা হয়, তখন সে-সব স্থানে ব্যবহার করা হ'ত 'জ'। উদাহরণ 'জত', 'জদি', 'জখন' ইত্যাদি

নিম্নে হ্যালহেড-রচিত ব্যাকরণের আলোকচিত্রের ফটোস্টেট সংযোজিত হ'ল—

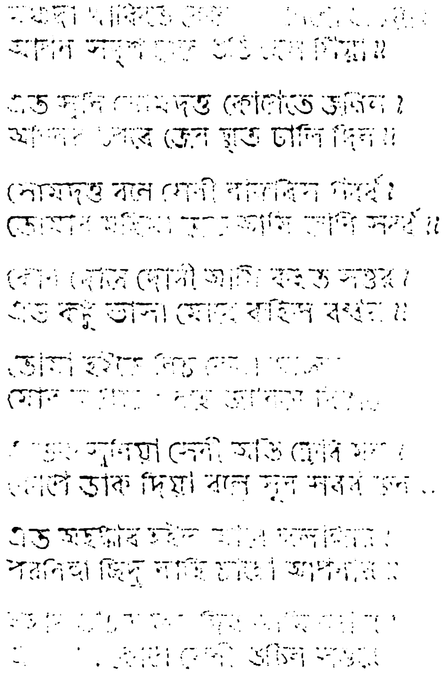

[illegible]
আপনি সত্বর [illegible] উঠে [illegible] গিয়া ॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জ্বলিল ।
আ[illegible] [illegible]রে জেন ঘৃত ঢালি দিল ॥

সোমদত্ত বলে [illegible] [illegible] [illegible] ।
তোমার [illegible] [illegible] আমি [illegible] সর্ব্বে ॥

[illegible] [illegible] লোকী আমি [illegible] [illegible] ।
এত কহুঁ [illegible] মোর [illegible] [illegible] ॥

তোমা হইতে [illegible] [illegible] [illegible]
মোর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সুনিয়া শেনী আজি [illegible] [illegible] ।
[illegible] ডাক দিয়া বলে সুন [illegible] [illegible] ॥

এত অহঙ্কার [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] জিদু নাহি [illegible] আপনার ॥

[illegible]
[illegible] [illegible] শেনী উঠিল [illegible]

---

[১] [illegible] [illegible] সম্পাদিত বৌদ্ধ চর্যাপদ (ঢাকা ১৯৬৬); চর্যাপদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৮৭), পৃ ৫৩

এ-ছাড়া, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে, মুছলিম আমলের কবি শেখ চাঁদ-রচিত 'সবে মেরাজ' পুথির একটি পৃষ্ঠার নমুনা[1] ও তার আধুনিক বাঙালা পাঠ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তা থেকে দেখা যায়, বাঙালা ভাষায় আধুনিক কালের শ, ষ, স-এর মধ্যে সেকালেও স-এর-ই গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি ছিল অধিক। শ, ষ-এর নয়। নিম্নে উপস্থাপিত ফটোকপি দেখলে তা বোঝা যায়।

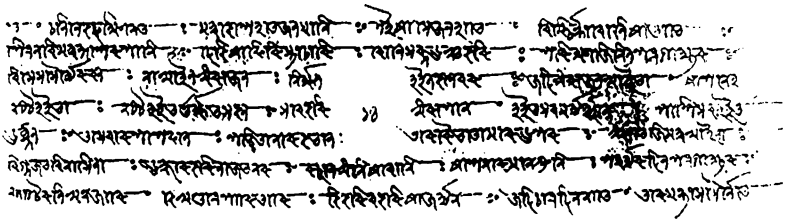

চলিলেক দক্ষিনেত। মদুকোপ হতে জল যানি। লইআ সেজল হাতে। বিচিন্তা বোলিল তাতে
পিএ নবি মদু কুপের পানি। সেকিআ ফিরিস্তাচারি। বোলে সব্দ উচ্চ করি। পরিস্কার জিনিল পএগাম্বর।
বিসেস নৈর্ত্তোর বল। না খাইল সুরাজল। নির্মল হইল কলেবর। জদি সুরা জল খাইতা। আপনেহ
নষ্ট হইতা। নষ্ট হইত উর্ম্মত সকল। সবে করি সুরাপান। হইত সব মর্ত্ত্য জ্ঞান। পাপিসব হইত
উদ্ধার। তা সবার পাপ ফলে। পড়িতা নারক তলে। ভার রৈত তোমার উপর। সুরা তেজি মধু খাইলা।
বিপ্ন জত বিনাসিলা। উদ্ধার করিলা জত নর। রছুলে সুনিআ বানি। আপনার মনে গুনি। পদূর্ত্তার দিল পএগাম্বর।
ললাটের লিখন জারে। কে খণ্ডাএ পারে তারে। কি করিব করিআ জতন। জদি চাএ দিনরাতে। তার অন্ত সে সৈর্ন্যাতে।

[1] শেখ চাঁদ : সবেমেরাজ।

অতএব, গ্রন্থকার তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন শিলালিপি থেকে শুরু ক'রে বর্ণমালার (১৭৭৩ সালের হস্তলিখিত) ছবি তুলে ধ'রে 'স'-এর পক্ষে যেসব তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন ক'রেছেন—তা নাকচ করা যায় না।

এছাড়া ড. রহমান তাঁর প্রবন্ধে আরও একটি অভিমত দান ক'রে ব'লেছেন—"বৃটিশ-পূর্ব আমলে, বাঙালীর মূল ধারার বাঙালা সাহিত্যে (পুথি-কেতাবে) অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর কোন স্থান ছিল না।" এ-বক্তব্য অত্যন্ত

---

১. দেখুন, খোন্দকার মুজাম্মিল হক : পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা (১ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৩), পৃ. ২১৫

গুরুত্বপূর্ণ—তা স্বীকার না ক'রে গত্যন্তর নেই।

কেননা, বাঙালা সাহিত্যের আদি নিদর্শন রূপে পরিচিত চর্যাপদে একটি মাত্র শব্দে (৩৪ নম্বর চর্যায়) বিসর্গ হরফের ব্যবহার আছে। আর আছে—৪/৫টি শব্দে 'অনুস্বার' হরফের ব্যবহার। কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার অনেক। তবে ড. রহ্‌মানের সমর্থনে একথা বলা যায় যে—'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কথা বাদ দিলে, মুছলিম পুথি-কেতাবে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বিরল। নেই বললেই চলে। বাঙালীর ভাষা-ব্যবহারের মূলধারায় যে; অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু বর্জিত শব্দ ব্যবহার করা হ'ত, সৈয়দ আকবর-রচিত 'জেবুলমুলক সামারোখ' পুথির নমুনা[৩] পর্যবেক্ষণ ক'রলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যে বাঙালা-ভাষার মূলধারায় ছিল না, তা ঠিক। উদাহরণস্বরূপ সৈয়দ আকবর-রচিত নিম্নোক্ত পুথির নমুনা-পাঠ লক্ষণীয়।

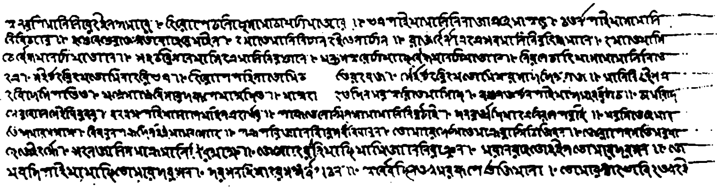

পুনরপি মালিনিরে কইল কুমারে। কিরোপে চলিছে সামা চায় গিয়া তারে। ডএ পাইয়া মালিনি না জাএ হেমাপুরে চতর্দ্দ্য পাইয়া সামা |মালিনি বিচারে। হস্তবেত্তে রাজসুতা বাহের অইল। কথাতে মালিনি গেল কইতে লাগিল। বাক্ত কৈর্ল্যাএ কএ সব মালিনির বিদ্বমানে। কথাতে যদি সে বৈদ্ধ যান গিয়া তানে। সহচরিগনে যাসি কএ মালিনির স্থানে। হস্তসপুরে গিয়াছে বৈদ্ধ যান গিয়া তানে। নিরলে চালিয়া সামা মালিনিতে কএ সইর্ত্ত্য করি কয় তোমি না করি ডএ। কিরোপে পাইলা তোমি চন্ডির কবজ। সেইর্ত্য করি কয় তোমি প্রসাদ দিমু গজ।। মালিনি কইল এক বিদেসি পন্ডিত। মন্ত্র সাস্ত্রে বিসারদ রোপে যাদুদিত।। যাদুকা কতদিন মর পুরিতে আসিছে। বউল জর্ত্তান পাইয়া কুমার রহিছে।। সামরি সেসেহ বোলে সেই বিরবর। বহু দুক্ষ পাইয়া বোলে রাইল একেশ্বর।। পত্রেতে লেখিল সামা মালিনির ঠাই। মনদুর্ক্ষ দিয়া কএ নিরলে পরাই।। হরসিতে হেমারতি কুমার সমুক্ষে। বিরহেণ পত্র লিখি হইয়া মন সোকে। পত্র পরি জানে দিয়ে সব বিবারন। তোমারে দেখিতে মনে রাখিছি জিবন। যে রোপে বসতি মর মন্ত্র সেই কর্ম্মে। সকল জানিল মাত্র মালিনির মুক্ষে। যে সোকে রহিয়াছি যামি জানে নিরাঞ্জন। মরনের হেতো হইল তোমার দরসন।। যে হেতু পাইয়া যাছি তোমার দরসন। দরসন দিয়া কর সকতী মুচন। পূর্ব্বে ছিল তনু মর রোপে উজ্জলা। তোমার দুক্ষে ভাবি২ তনু কই...।

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর : জেবুলমুলক সামারোখ
([illegible] পুথি ২, শির্ষ-৮-[illegible] বর্জিত পুঁথি)

---

[৩] দেখুন, খোন্দকার মুজাম্মিল হক, পূর্বোক্ত, ২১৯

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অকারণ বিসর্গের ব্যবহার অসংখ্য প্রচলিত ভুলের জন্ম দিয়েছে। যেমন:—মোঃ, আঃ, ডঃ, ডাঃ, চৌঃ, প্রাঃ ইত্যাদি। লেখনরূপে এ-সকল বিসর্গের কোলন রূপে ব্যবহার ব্যাকরণ-অনুমোদিত নয়। এ-বিষয়ে ড. মাহবুবুল হক 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামক গ্রন্থে নাতিদীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। তা গুরুত্বপূর্ণ। খোদ 'বাংলা " শব্দে অনুস্বারের অপব্যবহার সম্পর্কে ড. রহমান পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। তিনি ড. সুনীতিকুমার ও মেরি ফ্রান্সিস ডানহামের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে, তাঁদেরও আপত্তির উল্লেখ ক'রেছেন। সেদিকে কোন লেখক-পাঠক মনোযোগ দিয়ে এ-শব্দের বানান নির্ভুল ভাবে লেখার প্রয়াস পাবেন কি? এরকম অনুস্বার ব্যবহারের ফলে, আরেকটি প্রচলিত ভুল 'অংক' শব্দটি। যার শুদ্ধ বানান 'অঙ্ক'। অঙ্ক শব্দের অভিধানিক অর্থ যথাক্রমে "(১) চিহ্ন; লেখা; (২) কলঙ্ক, (৩) রাশি (গণিতে), আঁক, সংখ্যা, গণনা (৪) পরিমাপ, (৫) ক্রোড়; কোল; (৬) নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ, (৭) উদর বা পেশী; (৮) পাতার উপরিভাগ।" এ-ভুলটি হ'য়েছে—অকারণ অনুস্বার ব্যবহারের প্রবণতা থেকে। এরকম আরও ভুল হ'ল—ভংগ,বংগ, সংগে, গংগা, ইত্যাদি। অকারণে অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-ই শুধু নয়; অকারণে তৎসম বা বিদেশী শব্দও হ্রস্ব-'ই' কার দিয়ে লেখা হ'য়ে থাকে। সংস্কৃত-আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতেরা হুকুম জারী ক'রেছেন—দেশী ও বিদেশী শব্দে হ্রস্ব-'ই'-কার ব্যবহার ক'রতে হবে। অর্থাৎ বাঙালি, জানুয়ারি ইত্যাদি বানান লিখতে হবে। অথচ সংস্কৃত দেশী; না, বিদেশী তা বলা হয় না—কৌশলগত কারণে। বিদ্বানমাত্রই জানেন, আর্যরা বহিরাগত এবং তাদের ভাষা—সংস্কৃতও বিদেশী। ফলে, 'বাঙালা' লিখতে অনুস্বার-ব্যবহার এবং 'বাঙালী' লিখতে দীঘ-ঈ কারের বদলে হ্রস্ব-ইকারের ব্যবহার ক'রে—'বাংলা', 'বাঙালি' লেখা; 'বাঙালী'র বানান-চেতনার ঐতিহ্যবিরোধী। চর্যাপদে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ:—

"আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।" (৪৯ নম্বর চর্যা)।

লক্ষণীয় এখানে 'বঙ্গালী' ('বাঙালী' বোঝাতে) দীর্ঘ-ঈ কার দিয়ে লেখা হ'য়েছে।

এমনিভাবে, বাঙালা ভাষার প্রবহমান ধারার ওপর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ্যবাদী পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রভাব যে, বাঙালা ভাষার বানান, লিখন-পদ্ধতি, উচ্চারণ ও মিষ্টতার বহু ক্ষতি ক'রেছে—তা স্বীকার ক'রতেই হবে। বাঙালা শব্দকে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যে, গ্রন্থকার-কথিত মুছলিম আমলের মূল

বাঙালী জাতীয় চেতনার ঐক্য বিরোধী—তা অন্য সূত্র থেকেও জানা যায়। সে-বিষয়ে—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এম.এ. রহিমও ব'লেছেন—“বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞাসূচক ঔদাসীন্য এবং সংস্কৃত প্রভাবিত গৌড়ের (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) হিন্দু রাষ্ট্রে ও সমাজের নিকট বাংলা ভাষাও যুগ যুগ ধ'রে অপাংক্তেয় থেকে যেত এবং এর বর্তমান গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হ'ত। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেনি, তারা বাংলা ভাষা-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন।”[৫]

অতএব, ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, তাঁর “বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতি”র যে-“ব্যতিক্রমী ইতিহাস” তুলে ধ'রেছেন—তা ভুলের বিরুদ্ধে শুদ্ধতার, বিভক্তির বদলে ঐক্যের এবং আমাদের ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের সহস্রবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের পুন:প্রতিষ্ঠার অকথিত-ইতিহাস। আশা করা যায়, সে-বিষয়ে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং গ্রন্থটি লিপি-ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য ও জাতি সম্পর্কে সবাইকে নতুন এক বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ক'রবে। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রের-ই এ-গ্রন্থ খানি পাঠ করা উচিত। আমরা গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় রইলাম।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

---

[৫] ড. আব্দুর রহিম, অনুবাদ—মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম প্রকাশক, ঢাকা-১৯৮৪).পৃ.২৪৭।